বিসিসির পোস্টমর্টেম

বাংলাদেশের 'বাংলা' ভারতের নিয়ন্ত্রণে?

বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে কমপিউটার জগৎ তার প্রকাশনার সূচনালগ্ন থেকে এদেশে কমপিউটারকে জনপ্রিয় করার জন্য এবং কমপিউটার নির্ভর অর্থনীতির একটি ভেত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাঠক, শিল্প উদ্যোক্তা, সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকার ও বিরোধী নেতা নেত্রীদের বাস্তবমুখী ও পরামর্শধর্মী দিক নির্দেশনা দিয়ে আসছে। পাশাপাশি দেশকে কমপিউটারায়নে সমৃদ্ধ করার অন্তরায়গুলোও কমপিউটার জগৎ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নির্মোহভাবে পাঠক সমীপে বিভিন্ন সময়ে পেশ করেছে। কমপিউটার জগৎ-এর অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেদনগুলো পাঠককে করেছে আত্মপ্রত্যয়ী এবং সমস্যার গভীরে নাড়া দেয়া খবরগুলো সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে সচেতন করে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হতে সাহায্য করেছে।

কিছুদিন পাঠকের আশীর্বাদপুষ্ট কমপিউটার জগৎ পুনর্বার দেশ-জাতি এবং পাঠকদের দাবী পূরণের লক্ষ্যে কমপিউটারের সরকারী প্রতিষ্ঠান বিসিসি-র অতীত এবং বর্তমান বিশ্লেষণ করে এর উপর একটি পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়। কাজও শুরু হয়। কিন্তু হঠাৎ-ই মাসের মাঝামাঝি জানা যায় ভারত বাংলা প্রমিত তথা বিনিময় কোডিংয়ের কাজ শেষ করেছে এবং সেটি আন্তর্জাতিক প্রমিতকরণ সংস্থা (আইএসও এবং আইইসি) হতে অনুমোদনও করিয়ে নিয়েছে।

খবরটি কমপিউটার জগৎ পরিবারের কর্মীমণ্ডলীকে মর্মাহত করে (পাঠক, জানি এ পরিবারের সদস্য হিসেবে আপনিও এখন মর্মাহত, আপনাদের অনুভূতি জানাবেন)। কমপিউটার জগৎ ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেয়, জানতে হবে-- কিভাবে বাংলাদেশের 'বাংলা'-র কাজ ভারতের দিল্লী আগে শেষ করল।

এ সম্পর্কে জানার পর কমপিউটার জগৎ পূর্ব পরিকল্পিত প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় রদবদল করে। সংক্ষেপে বিসিসির পোস্টমর্টেমের কাজটি সেরে নতুন ইস্যুটিকে প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় জুড়ে দেয় নতুন শিরোনামে। প্রচ্ছদ প্রতিবেদন তৈরীর জন্য কমপিউটার জগৎ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ করে যা জানতে পেরেছে তা-ই নির্মোহভাবে নিটোল উপস্থাপন ঘটেছে গোলাম নবী জুয়েল এবং মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী-র ও লেখাতে।

বখতিয়ার খলজীর অবিস্মরণীয় ভারত বিজয়গাঁথা আমরা জানি। বিনা যুদ্ধে রাজ্য জয়ের এমন কাহিনী আর জানা যায় না। যুদ্ধ করতে না হলেও খলজীকে ভারতে সশরীরে উপস্থিত হতে হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশের 'বাংলা'-র নিয়ন্ত্রণ গ্রহনের জন্যে ভারত হতে কাউকে এদেশে আসতে হয়নি।

ত্রয়োদশ শতকে খলজীর আক্রমনে ভীত হয়ে তৎকালীন রাজা লক্ষণ সেন দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন কিন্তু বাংলাদেশের জন্যে সে পথটুকুও নেই। বাংলা একাডেমী, কমপিউটার কাউন্সিল এবং তার রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরম দায়িত্বহীনতা জাতির বাংলা ভাষার অহংকারকে ভারতের পায়ের তলায় হেলায় লুটিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীদার বাংলাদেশকে 'বোকার স্বর্গে' রেখে কোন রকম সুযোগ না দিয়ে পাশ্ববর্তী ভারত কানপুর আইআইটিতে তৈরী তার বাংলা প্রমিত তথ্য বিনিময় কোড-এর স্থায়ী বিশ্বস্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে আন্তর্জাতিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইনষ্টিটিউট (আইএসও)-এর মাধ্যমে। আমাদের বাংলা একাডেমী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অযোগ্য পণ্ডিতমন্য ব্যক্তিবর্গ, কমপিউটার কাউন্সিল, এর দায়িত্বে ন্যস্ত বিজ্ঞ রাজনৈতিক পুরুষ ডঃ মইন খান, কাউন্সিল চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার এ বিপর্যয়ের কোন খবরই রাখেননি।

রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে বছরে ৯ লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়ে বাংলাদেশ আইএসও-র সদস্য পদ ভোগ করে। কিন্তু এ সংস্থার প্রেরিত চিঠিপত্র ও কাগজপত্র কিছুই পড়ে দেখার কোন গরজই এসব কর্মকর্তার নেই। ভারতীয় বাংলা কোড-এর (ISCII) স্বীকৃতিলাভের সময় আপত্তি জ্ঞাপন কিংবা বাংলাদেশের অধিকারের কথা বলার গরজও অনুভব করেননি বিসিসি কিংবা তার কর্তারা। বরং ভারত বাংলা কোডিং-এর আইএসও স্বীকৃতি আদায় করে ঢাকাকে টেক্কা দেবার পর মন্ত্রী এনে অসম্পূর্ণ একটি কীবোর্ড ও কোডিং 'পাশ' করিয়ে অনেক রাতে সংবাদপত্রে প্রেসবিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় নিজেদের আত্মরক্ষার একটা অজুহাত দাঁড় করানোর লক্ষ্যে।

বাংলাদেশের মাথামোটা শাসকেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে জাতির উপর নেমে আসছে একের পর এক দুঃসহ পরাজয়। এশিয়ার আকাশে নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের কক্ষপথ এভাবে হাতছাড়া হয়ে গেছে চিরতরে।

আর এবার চোখের সামনে সেনাকর্তা, কেতাব রচয়িতা, মেশিন বিক্রেতা মহাজনদের নিয়ে শাসকদের কর্মহীন দায়িত্বহীন মজমা পরিচালনার পরিণামে বাংলাভাষার উপর বাংলাদেশের বিশ্ব অধিকার বিপন্ন হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা, থাইল্যাণ্ডের মত দেশ পর্যন্ত আইএসওতে নিজস্ব ভাষার কোডিং জমা দিয়ে অপেক্ষা করছে দু' বছর ধরে। ভাষার অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না যে জাতির সেই বাংলাদেশকে ফেলে রেখে এ জাতির ভাষায় বর্ণমালার কোডিং তৈরী করে ফেলেছে ভারত, কেবল তা নয়, তারা বাংলা ভাষার উপর যে সফটওয়্যার তৈরীর কাজ সেরেছে, তা অস্ত্রাশী শক্তিতে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করবে অচিরেই। বিনা যুদ্ধে ভাষা ও বর্ণের উপর জাতীয় অধিকার ছেড়ে দিয়ে এ সরকার ১৯৫২-র ও ১৯৭১-এর বিজয়কে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। অথচ কেতাব রচয়িতা বাংলা ভাষার অহংধারী তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে এখন পর্যন্ত এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাংলাদেশের কমপিউটার বিজ্ঞানী ডঃ জাফর ইকবাল এ ব্যর্থতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে দু'বছর আগেই জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন: অবিলম্বে বাংলা বর্ণমালা ও চিহ্নসমূহের তথ্য বিনিময় কোড (ASCII এর অনুরূপ) প্রমিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, যদি অন্য কোন দেশ তাদের কীবোর্ড প্রমিতকরণ করিয়ে নেয় তাহলে আমাদের কিছু করার থাকবে না। এমন কোন কোডিং তৈরি করে আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি পেতে কমপক্ষে ২ বছর সময় লাগে। কমপিউটার জগৎ দু'বছর ধরে সুদূর চীন ও আমেরিকা প্রবাসী বাঙ্গালীদের লেখাসহ পাঁচ-সাতটি বিরাট ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে মাথাকুটবার পরেও উন্নাসিক আমলাতন্ত্র ও রাজনীতিকদের মধ্যে বিন্দুমাত্র গরজ তৈরী হয়নি। কারণ, কমপিউটারের সাথে সংস্রবহীন, এমনকি কমপিউটার বিদ্বেষী হীনমন্য কিছু লোক এসব ক্ষেত্রে কর্মকর্তা হতে প্রধানের দায়িত্বপালন করছেন। সব কিছুকে উপেক্ষার মধ্যেই তারা আত্মজাহিরের ক্ষমতা প্রদর্শন করেন কিন্তু একবারও ভেবে দেখেন না, এর ফলে জাতি কী গুরুতর সংকটে পতিত হচ্ছে।

বাংলা ষ্ট্যাণ্ডার্ড বর্ণমালা কোড কি?

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে এই শাখার একটি অপরিহার্য বিষয় তথ্য আদান-প্রদান (Information Interchange)। বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন তথ্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর। এটি হয়ে থাকে কমপিউটার ডিস্ক, টেলিযোগাযোগ, উপগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে। নির্দিষ্ট ভাষায় তথ্যের সার্বজনীন আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে নির্দিষ্ট প্রমিতকরণের বা ষ্ট্যাণ্ডার্ডের। যাতে সেই ভাষার বর্ণমালার অনুক্রমের একটি নির্দিষ্ট ধারা থাকবে এবং প্রতিটি বর্ণের জন্য একটি তালিকায় নির্দিষ্ট স্থান থাকবে। ফলে কোন স্থানের নির্দিষ্ট তথ্যের বর্ণগুলোকে ঐ তালিকায় উল্লেখিত বর্ণের স্থান অনুযায়ী যে মান হয় তাতে রূপান্তর করে অন্য স্থানে পাঠালে দ্বিতীয় স্থানের যে কেউ উক্ত তথ্যকে ঐ একই তালিকার সাহায্যে তাদের বোধগম্য অবস্থায় নিয়ে আসতে পারবে। দুই স্থানের বর্ণমালা তথ্য বিনিময় কোড ভিন্ন হলে তথাকে বোধগম্য অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবত একটি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বর্ণমালা কোড তালিকা তৈরীর কাজ চলছিলো। প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা, স্থানীয় প্রযুক্তিবিদদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং কিছু ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত স্বার্থ সচেতনতার কারণে এই কাজে বিলম্ব হয়। এরই মধ্যে ভারতের একটি কোড তালিকাকে প্রমিতকরণের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ড অরগানাইজেশন এবং ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রোটেনিক্যাল কমিশন স্ট্যাণ্ডার্ড করে নেয় যা আমাদের এখানকার অনেক ভাষাবিদ এবং প্রযুক্তিবিদের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এ ব্যর্থতার ভয়াবহতা কতটুকু

ইতিমধ্যে ভারতীয় বাংলা বর্ণমালার কোডিং বা হরফ সংকেত প্রমিতকরণ হয়ে যাওয়ায় জাতিসংঘ সহ বিশ্ব সংস্থাগুলি অবশ্যই তা ব্যবহার করবে। যেমন মাইক্রোসফট বা এপল কোম্পানী এই কোড ব্যবহার করে যদি কোন সফটওয়্যার বা ইন্টারফেস বাজারে ছাড়ে তাহলে অবধারিত ভাবে এদেশের প্রায় সকল ব্যবহারকারী তা ব্যবহার করবে। এর অর্থ হলো, পুরো বাজার, ভাষা, সাহিত্য আমাদের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যহীন ভারতীয় প্রমিত কোড-এর দখলে চলে যাবে। যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা যদি এ ভাষায় ইলেকট্রনিক কোন তথ্য প্রেরণ করে তাহলে তারা বোধগম্য কারণেই আইএসও অনুমোদিত ভারতীয় কোডই অনুসরণ করবে।

আমাদের এবং ভারতের কোড আলাদা হলে দুই বাংলার বই-পুস্তক, ভাষা, সাহিত্য যদি ভিন্নকে ধারণ করা হয়, তা আমরা সহজে অনুসরণ করতে পারবো না। কারণ, ভারত

বাংলাভাষার কোডিং তৈরী করেছে সেদেশের আরো আটটি ভাষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত আইএসও ডকুমেন্ট থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের বিভিন্ন ভাষাসমূহের মধ্যে একটি সহজসাধ্য সামঞ্জস্য রক্ষার কারণে বাংলাভাষার বর্ণানুক্রম রক্ষা করা হয়নি এবং অন্যান্য আরও কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় বর্তমানে সম্পূর্ণ অব্যবহৃত ও অপ্রয়োজনীয় বেশ কিছু অক্ষর (যেমন, অহমীয় অক্ষর) এতে সমন্বয় করা হয়েছে।

দি সেইফওয়র্ড জানিয়েছে, 'আইএসও স্ট্যাণ্ডার্ড 'বাংলা' প্রমিত তথ্য বিনিময় কোডে যে অক্ষরক্রম অনুসৃত হয়েছে, তা বাংলা ভাষার প্রচলিত কোন অভিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আভিধানিক ক্রমানুযায়ী তথ্য সাধারণভাবে সর্ট হবে না'। তারা আরো জানিয়েছে, 'বাংলা ভাষার প্রচলিত দু'একটি মৌলিক অক্ষর (যা অন্য কোন অক্ষরের সমন্বয়ে উপস্থাপন সম্ভব নয়) এই কোডে অনুপস্থিত। যেমন ঃ 'ৎ' এবং 'ঃ' (দাঁড়ি)। উল্লেখ্য, কোড টেবিলের শেষ কলামে অবস্থিত দৃশ্যতঃ দাঁড়ির মত চিহ্নটি প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ি নয়।'

ভারতীয় কোডিং সম্পর্কে অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার্সের শামসুল হক চৌধুরী বলেন, 'আমাদের ধারণার সাথে ভারতীয় কোডিং মিলছে না। তাদের সবটাই উচ্চারণভঙ্গীর (Phonetic) অর্থাৎ ধ্বনির উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে।'

যা কিছু মতামত বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছে ভারতীয় কোডিং সম্পর্কে তা তারা জানাচ্ছেন বিএসটিআই (বাংলাদেশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড এণ্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন)-তে আসা আইএসও-র বই হতে।

বিসিসির শশব্যস্ততা— এখন উপায়?

বই থেকে এটিও নিশ্চিত হওয়া গেছে ভারত বাংলা কোডিংয়ের আন্তর্জাতিক প্রমিতকরণের কাজটি সেরে ফেলেছে এবং পুরো কাজটি ভারত প্রায় নিঃশব্দে সেরে ফেলে। কিন্তু বিএসটিআইতে আগত আইএসও-র বইটি কথার তুবড়ি ছুটিয়ে ব্যস্ত, একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে সুখ্য গোছের কমিটি, উপ-কমিটি, সাব-কমিটির সদস্যদের মস্তিষ্কে সশব্দে বিস্ফোরণ ঘটায়। হঠাৎ-ই তাদের বোধোদয় হয় জ্ঞাত-মান সব গেল। কতটুকু গেল আর কতটুকু রইল তা বোঝার জন্যে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল জরুরী ভিত্তিতে কাউন্সিল মিটিং ডাকল। ১৯৮৭ সালে গঠিত 'কমপিউটারে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির গত ৩০ জুন সভায় যে কমপিউটারে বাংলা কী-বোর্ড লে-আউট এবং বাংলা প্রমিত তথ্য বিনিময় কোড' অনুমোদিত হয় তা ১৩ জুলাই বিসিসির দ্বাদশ কাউন্সিল সভায় অনুমোদন করা হয়। তাড়াহুড়ার জন্য এতে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কতগুলি অক্ষরচিহ্ন বাদ পড়ে যায়। তবে বিসিসির প্রশাসনিক কর্তাদের ভাগ্য ভাল আমাদের দেশের সম্মানিত অতি ব্যস্ত শিক্ষামন্ত্রী এবার তাদের বিমুখ করলেন না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৭ জানুয়ারী ১৯৯৩ তারিখের এক অফিস আদেশবলে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের সকল কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব (কিন্তু ক্ষমতা নয়) মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস খানের উপর ন্যস্ত করা হলেও জাতির এই দুর্যোগের দিনে সকল ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং কাউন্সিল মিটিংয়ে উপস্থিত হলেন। এটি ছিল তার দীর্ঘ প্রায় দেড় বছরের দায়িত্ব পাওে দ্বিতীয় মিটিং। (অতীত কাউন্সিল চেয়ারম্যানদের সময়ে প্রয়োজনীয় মিটিং আরো বেশী হয়েছিল)। এই মিটিংয়ে প্রথমবারের মত বিএসটিআই হতেও প্রতিনিধি ডাকা হয়। না ডেকে উপায় ছিল না। কারণ বিএসটিআই হলো আইএসও-র বাংলাদেশে আইনি প্রতিনিধি। মিটিং হলো। মিটিংয়ে বাংলা বর্ণমালার জন্য কমপিউটার কোডিং এবং কী বোর্ড লে-আউটকে অনুমোদন করিয়ে নেয়া হলো।

বলা হলো আইএসও-তে এটি পাঠিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিলেই হবে। কিন্তু এর ফলে কি গুরুতর দুটো সংকট তৈরী হতে পারে তা আর মিটিংয়ে আলোচনা করা হলো না। এখন যে দুটো পথ খোলা রয়েছে তাকেই কেউ কেউ সুযোগ ভাবতে চাচ্ছেন কিন্তু এ দু'পথেই সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেশী। প্রথম উপায় যেটি এখন আমাদের হাতে রয়েছে সেটি হলো ভারত কি করেছে তা ভুলে গিয়ে আইএসওতে বাংলাদেশের জন্যে বাংলা ভাষার জন্য একটা কোডিং-এর অনুমোদন চাওয়া। এটি হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সমস্যা এবং একটি নীতির প্রশ্ন চলে আসছে। সমস্যা হলো আইএসও-র অনুমোদনের জন্যে যে নিয়মনীতি মেনে কোডিং প্রমিতকরণ করতে হবে তা আমাদের দেশের কোন পণ্ডিতেরই ভালভাবে জানা নেই। অন্য সমস্যাটি হলো যদিও বা জানা যায় এবং বাংলাদেশ আলাদা কোডিং তৈরী করে নেয় সেক্ষেত্রে অন্ততঃ ইলেকট্রনিক তথ্য আদান-প্রদান ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় যে উপায়টি রয়েছে তা হলো নতমুখে ভারতের সাথে যোগাযোগ করে একটি আপোষ রফার চেষ্টা করা। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রমিতকরণ সংস্থার সাথেও যোগাযোগ গড়ে তোলা। এক্ষেত্রেও দুটো সমস্যা রয়েছে। এক ঃ ভারতের সাথে যোগাযোগ করে যৌথ কোডিং-এর প্রস্তাব দিলেই তা যে ভারত গ্রহণ করবে তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই বরং ভারত গ্রহণ করবে না এমন কথাই জোর দিয়ে বলা যায়। ইতিমধ্যে ভারত তাদের প্রমিত করা কোডিংভিত্তিক সফটওয়্যার বিক্রির জন্য পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুভাষিক কমপিউটিংয়ের প্রতিষ্ঠান সিডিএসির মাধ্যমে ৩২টি ডিস্ট্রিবিউটর নিযুক্ত করেছে এবং বিদেশে বাজারজাত করার জন্যে ডিলার খুঁজছে। শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের কিছু কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সফটওয়্যারটি ক্রয় করেছে। (এসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের ভারত প্রতিনিধি পাঠানো এ সংখ্যার খবর দেখুন)। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে সমস্যাটি রয়েছে তা হলো আইএসও-র সাথে যোগাযোগ। আইএসও-র সাথে যোগাযোগের জন্য আমাদের এখানে রয়েছে বিএসটিআই। প্রমিতকরণের জন্য বিএসটিআই নিজে থেকে উদ্যোগী হয় না। এটিকে উদ্যোগী করতে হয়। যেহেতু বিষয়টি কমপিউটার সংক্রান্ত তাই এক্ষেত্রে বিসিসিকে উদ্যোগীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

কেন ব্যর্থ হল বিসিসি

কিন্তু বিসিসি যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে সময়মত কাউন্সিল মিটিং না হওয়া এবং উপদেষ্টা পরিষদকে কার্যকরী ভূমিকা রাখার সুযোগ না দেয়ার কারণে। বিসিসি দেশের কমপিউটারায়নের জন্যে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে এমনটা অনেকেই ভেবেছিলেন কিন্তু যারা বিসিসির আদ্যোপান্ত জানেন তারা এমন আশা কখনো করেননি।

১৯৮৩ সালে জাতীয় কমপিউটার কমিটি (এনসিসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিসিসি অঙ্কুরিত হয়ে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ কমপিউটার বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে বর্তমান বিসিসি দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৮৩ সনের তৎকালীন সামরিক সরকারের চরিত্র ও নীতির প্রতিফলন ঘটেছিল এনসিসির মধ্যে। এনসিসি যেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশের কমপিউটারায়নের প্রক্রিয়া 'নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন'-এর জন্য। শুরু থেকে ধরেই নেয়া হয়েছিল যে দেশের কমপিউটারায়ন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। তাই এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত করতে হবে। কোন সংস্থায় কমপিউটার বসাতে হলে কয়েক পৃষ্ঠার একটা ফরমপূরণ করে কমপিউটার কমিটির কাছে সরেজমিনে জবাবদিহি করে কমপিউটার স্থাপনের অনুমতি নিতে হতো। এর ফলে দেশে কমপিউটার প্রয়োগ প্রসারে সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে এনসিসি সেই পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

জাতীয় কমপিউটার কমিটির ঘোষিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেশে কমপিউটারায়ন প্রক্রিয়ায় যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছুটা সংশোধন এবং এর কাজ চালিয়ে নেবার জন্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকার এক 'সিদ্ধান্ত' বলে বাংলাদেশ কমপিউটার বোর্ড গঠন করে। কিন্তু এই 'সিদ্ধান্ত'-এর মাধ্যমে বিসিবির উপর এমন কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয় যা কিছুটা উদ্ভটই ছিল। যেমন সিদ্ধান্ত হয় — 'কমপিউটারে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, পেরিফেরাল এবং কমুনিকেশন সংক্রান্ত প্রযুক্তির উপর যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা', 'দেশে ও বিদেশে কমপিউটার বিজ্ঞানের উপর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয় সাধন' এবং 'কমপিউটার কোর্সের পাঠ্যসূচী নির্ধারণ' ইত্যাদি।

প্রথমোক্ত দায়িত্বটি ছিল উদ্ভট, অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। অপরদিকে শেষোক্ত দায়িত্ব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইনগত অধিকার ও ক্ষমতার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সচেতন মহলে বাংলাদেশ কমপিউটার বোর্ড আস্থার ধলে আতঙ্ক সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

যে সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশ কমপিউটার বোর্ড গঠন করা হয় তা এ কারণেও ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে, এর মাধ্যমে যে সংস্থার সৃষ্টি হয় তা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল, নাকি সংযুক্ত বিভাগ বা দপ্তর ছিল তা সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এর কার্যক্রম পরিচালন কঠিন হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ কমপিউটার বোর্ড ঋল্পায়ু সংস্থা ছিল।

১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এক অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে বাংলাদেশ কমপিউটার বোর্ডকে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলে রূপান্তর করা হয়। বিসিবির বেশ কিছু বিতর্কিত দায়িত্ব বাদ দেয়া হয় অথবা পরিমার্জিত করা হয়। এই অধ্যাদেশে বিসিসি-র যেসব দায়িত্বাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে তা বেশ ব্যাপক ও বিস্তৃত।

বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির আত্মীকরণ ও দেশের উপযোগী করার জন্য তার উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্য নিয়ে বিসিসির কার্যাবলী (সংক্ষেপে) নির্ধারণ করা হয় এভাবে— জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে কমপিউটারের ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়ন এবং কমপিউটার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশী নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্ববাজারে মানবসম্পদ ও দক্ষতা রপ্তানীর উদ্যোগ নেয়া। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য অনুদান প্রদান করা।

তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী ও বেসরকারী এবং দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা ও সহযোগিতা করা এবং কমপিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির মান ও স্পেসিফিকেশন্স নির্ধারণ করা।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বিসিসি গঠনের পরও দেশের কমপিউটারায়নের গুণগত কোন পরিবর্তন হয়নি। কেন হয়নি সে কারণ খুঁজতে গিয়ে যে কারণগুলো আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে সেগুলোর অন্যতম হলো ঃ

১। কর্মকর্তাদের ১৩টি পদের মধ্যে ১০টি পদই বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রেষণে কর্মকর্তা এনে পূরণ করা হয়েছে। এদের অনেকের সংশ্লিষ্ট পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত যোগ্যতা নেই।

২। জন্মলগ্ন থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিসিসি রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে একটি সংস্থা ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে বিসিসিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এখনো তাই আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হওয়ার পর বিসিসির চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রীর অতি ব্যস্ততার কারণে কাউন্সিল মিটিংয়ের সংখ্যা হ্রাস পায় এমনকি প্রয়োজনীয় কাউন্সিল মিটিংটিও সম্পাদন দুরূহ হয়ে পড়ে। পরিসংখ্যান হতে জানা যায় ১৯৯০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী কাউন্সিলের প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী ১১ মাসে মিটিং হয় ৭টি। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে ২৭/১/৯১ তারিখে বিসিসি ন্যস্ত হওয়ার পরে গত ৩০ মাসে মিটিং হয়েছে মাত্র ৫টি।

৩। বিসিসিকে পূর্ণ মাত্রায় কার্যকরী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৯০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী সম্বলিত অর্গানোগ্রাম তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয় অনুমোদন করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। কিন্তু এই অর্গানোগ্রামটি এখনো অনুমোদন পায়নি। সার্ভিস রুল এখনো চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি বলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিচ্ছে না বলে জানা যায়।

৪। ৩৭টি অস্থায়ী পদের মধ্যে ৩টি কর্মকর্তার ও ২টি কর্মচারী পদ শূন্য রয়েছে।

৫। জায়গার অভাবে দু'জায়গায় দুটো অফিস বিল্ডিং ভাড়া নিতে হয়েছে।

৬। শেরেবাংলা নগরে ১.৫৫ একর জমি বরাদ্দ আছে কিন্তু সরকারী অর্থ না থাকায় এই জমিটির দখল গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেটে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রদানের জন্যে এ বাবদ ১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

৭। জাতীয় কমপিউটার বোর্ড (জাকব) এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কে সরকার প্রদত্ত বাজেট নিম্নরূপ ঃ

সাল	টাকার পরিমাণ
১৯৮৮-৮৯	১,০০,০০,০০০
১৯৮৯-৯০	১,০০,০০,০০০
১৯৯০-৯১	৮২,৬৪,০০০
১৯৯১-৯২	৭৫,৯৪,০০০
১৯৯২-৯৩	৭০,০০,০০০

এর মধ্যে সর্বশেষ অর্থ বছরে ব্যয় হয়েছে ৫২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। বাকী অর্থ ফেরত গেছে। অথচ অর্থের অভাবে অনেক কাজ হয় না এমন কথাও শোনা যায়।

৮। বিসিসিতে সিবিএ থাকার আইনী ভিত্তি রয়েছে কিন্তু বর্তমানের ৩২ জনের সংস্থায় ১১ সদস্যের সিবিএ থাকার নৈতিক যুক্তিটি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

৯। ১৯৯২ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের ১১তম মিটিংয়ে বিসিসির উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। মূলতঃ নির্বাহী পরিচালককে পরামর্শ দেয়ার জন্যে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ মঈন খান এমপি। সদস্য হিসেবে দেশের প্রচলিত ক্ষমতার কাঠামো অনুসারে এক নম্বরের স্থানটি দখল করেন রওশন আরা হেনা এমপি।

ফলে কার্যতঃ নির্বাহী পরিচালক অকার্যকর হয়ে পড়ে। পাশাপাশি নির্বাহী পরিচালককে উপদেশ দেয়ার জন্য গঠিত উপদেষ্টা পরিষদও অচল হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য এখন পর্যন্ত উপদেষ্টা পরিষদের একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। এমন আরো অনেকগুলো কারণে জনগণ বিসিসিকে যেভাবে পেতে চেয়েছিল সেভাবে পায়নি। জনগণের স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়েছে জনগণের অর্থে লালিত বিসিসি।

আলাপকালে বিসিসির ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ মঈন খান জানালেন, বিসিসিকে নিয়ে তার যে পরিকল্পনা ছিল তাও সফল হয়নি। তিনি ভেবেছিলেন, বিসিসি হবে জনগণমুখী, সেবাধর্মী এবং কমপিউটারের নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে বিস্তারিত কর্মকাণ্ডভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান। যেটার কাজের ক্ষেত্র ঢাকায় সীমিত না থেকে দেশময় ছড়িয়ে পড়বে।

বিসিসির নির্বাহী পরিচালক এম. ইদ্রিস আলী সংস্থার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্যি নেই। ইচ্ছে আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেই। তিনি বলেন,

TABLE 18 – Row 09: BENGALI

	098	099	09A	09B	09C	09D	09E	09F
0		ঐ	ঠ	র	◌ী		ৠ	ব
1	◌ঁ		ড		◌ু		ৡ	র
2	◌ং		ঢ	ল	◌ূ		◌ৃ	\
3	◌ঃ	ও	ণ		◌ৃ		◌ৄ	ট
4		ঔ	ত		◌ৄ			/
5	অ	ক	থ					৵
6	আ	খ	দ	শ			০	৶
7	ই	গ	ধ	ষ	ে◌	◌ী	১	।
8	ঈ	ঘ	ন	স	ৈ◌		২	৸
9	উ	ঙ		হ			৩	৹
A	ঊ	চ	প				৪	৺
B	ঋ	ছ	ফ		ো		৫	
C	ঌ	জ	ব	◌়	ৌ	ড়	৬	
D		ঝ	ভ		◌়	ঢ়	৭	
E		ঞ	ম	◌া			৮	
F	এ	ট	য	ি◌		য়	৯	

G=00 P=00

চিত্র ঃ আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএসও এবং আইইসি কর্তৃক অনুমোদিত ভারতীয় ISCII-র অহমিয়া বর্ণসহ বাংলা কোডের টেবিল।

'কমপিউটার বিষয়ে আমাদেরকে একটা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা রচনা করতে হবে এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।'

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার দীর্ঘ ২২ বছর পরেও এ জাতি কর্মের ঐক্যসূত্রতা গড়ে তুলে একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে পারেনি।

বিশেষজ্ঞরা কে কি ভাবছেন

কেন এমনটা হলো? মোস্তফা জব্বার মনে করেন, এই জাতীয় বিপর্যয়ের ব্যর্থতা পুরোপুরি বিসিসির। তিনি বলেন, ৫ বছরের ৫টা মিটিং ৫ সপ্তাহেই হতে পারত। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের যারা আইএসও-তে প্রতিনিধিত্ব করে জাতির কাছে তাদের জবাবদিহি করা উচিত। এমনটা হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার্স-এর শামসুল হক চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশের এসকী কোডিং চূড়ান্ত করণের জন্য বিলম্বের কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে বিসিসির সভা অনুষ্ঠানে দেরী করা। এজন্যে বিসিসি সম্পূর্ণভাবে দায়ী। বিসিসি কমিটি গঠন করেছে, এতে বুয়েটের ভিসিকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে তাঁকে অনেক সময় সভায় পাওয়া যাচ্ছে না। বা অনেক সময় বিসিসির প্রধানকে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না ইত্যাদি কারণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড এসকী তৈরীতে বিলম্ব হয়েছে। তাছাড়া এক সময় বাংলা একাডেমীর উপর নির্ভর করতে হয়েছে। সেটাও দেরীর কারণ হতে পারে।' তিনি বলেন, 'সাত বছর আগেই যদি ষ্ট্যাণ্ডার্ড করা হতো তবে কোন সমস্যাই হতো না। অন্যান্য দেশে বিশেষজ্ঞ ছিল, আমাদের দেশে ছিল না। এ ব্যাপারে যারা আগ্রহী ছিলেন তারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। আর যারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন তারা আগ্রহী ছিলেন না। সরকারী পর্যায়ে এক্সপার্ট না থাকায় সরকার ব্যবসায়ীদের সহায়তা কামনা করেছে। তবে বিসিসির ৫টি সভা করতে সময় লেগেছে ৫ বছর'। তিনি আরো বলেন, 'এসকী কোডিং এবং কী বোর্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড করাতে বিলম্বের ফলে জাতীয়ভাবে কোন সমস্যা হয়নি বলে মনে করি।'

এ প্রসঙ্গে সাইফুদ্দোহা শহীদ বলেন, 'আমাদেরটা চূড়ান্ত করণের ব্যাপারে বিলম্বের কারণ অনেক। আর আইএসও-তে ষ্ট্যাণ্ডার্ড করার ব্যাপারটি কখনোই শেষ করা নয়। কমপিউটার প্রযুক্তি পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুনটি আবার ভবিষ্যতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড হবে। আমাদেরকে ভারতীয়টা ফলো করার দরকার নেই। কারণ আমরা নিজেরাই আমাদের মত করে তৈরী করে নিতে পারি। টেকনোলজির কারণে ভাষার পরিবর্তনের দরকার নেই।'

সমুদ্র হক যে ঘটনা ঘটে গেল তা হওয়ার জন্য বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, বিসিসি, এবং বিএসটিআইকে দায়ী করেছেন।

বিসিসির ডেপুটি ডাইরেক্টর রুহুল আমিন বলেন, 'ভারত তাদের প্রমিত কোড আইএসও থেকে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে তাতে আমাদের কোন সমস্যা হবে না। আমরা আমাদেরটা পাস করিয়ে নেব।'

কোডিং আইএসও হতে পাস করানোর জন্যে বিসিসিকে বিএসটিআই-এর শরণাপন্ন হতে হবে। নিয়ম হলো আইএসও-র সদস্য রাষ্ট্রের নির্ধারিত প্রতিনিধি কোন একটি পণ্য নিয়মমাফিক পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর আন্তর্জাতিক ষ্ট্যাণ্ডার্ডের জন্যে আইএসওর নিকট আবেদন করে। সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত আইএসও-এর সদর দপ্তর তখন সেই আবেদনে বর্ণিত পণ্যের খুটিনাটি দিকগুলো জানিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিকট কাগজ পাঠায়। কোন একটি পণ্যের রেজিষ্ট্রির জন্য মোট সদস্য রাষ্ট্রের ৭৫ শতাংশের অনুমতির প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে আইএসও-র প্রতিনিধি হলো বিএসটিআই।

ভারত যখন কোডিং রেজিষ্ট্রি করেছে তখন সঙ্গত কারণেই খবরটি বিএসটিআই-র জানার কথা। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বিএসটিআই 'বাংলা'-র অনুমোদনের চূড়ান্ত খবরটি জানতে পারলেও আগের খবরগুলো জানতে পারেনি। এ ব্যাপারে সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিটর সিরাজুর নবী **কমপিউটার** জগৎ-কে জানান, নিয়ম অনুযায়ী ভারতের কোডিংয়ের প্রক্রিয়ার খবরটি আমাদের বহু আগে জানার কথা। কিন্তু এ সংক্রান্ত কাগজপত্র আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। কেন পৌঁছায়নি তা জানার জন্যে আমরা আইএসও-তে চিঠি লিখেছি। এর জবাব পেতে মাস খানেক লেগে যাবে।

এদিকে আইএসওতে ভারতের কোডিং চূড়ান্ত হয়ে যাবার পর বিসিসি এবং বিএসটিআই উভয় দফতরই

(২৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

সকল সম্ভাবনা ও সমর্থই আমাদের আছে, দরকার শুধু যোগ্য নেতৃত্ব। অনেকের কাছে আমাদের সামর্থ্য ও সম্ভাবনার কথা হাস্যকর ঠেকতে পারে তাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে হচ্ছে, মার্কিন গবেষণা সংস্থা NASA–র মত কর্মক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় কমপিউটারবিদগণ প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষর রাখছেন। পৃথিবীর সেরা কমপিউটারবিদদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এদেশেরই সন্তান। সুতরাং আর সময় ক্ষেপন না করে যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে এ অত্যাধুনিক ও অতিপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তিকে করায়ত্ব করবার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা খুবই আশান্বিত হয়েছি যখন এবার বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে (প্রায় ১৯৫) কিন্তু আমরা জানি না এই ১৯৫ এর মধ্যে কত শতাংশ কমপিউটার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বা আদৌ এ খাতে কোন বরাদ্দ আছে কি না?

শিক্ষার ব্যাপক প্রসারও আধুনিকীকরণ, গবেষণার মানোন্নয়ন এবং সার্বিক জাতীয় অগ্রগতির জন্য কমপিউটারের বিকল্প কোন প্রকল্প আমাদের কর্তাব্যক্তিরা কি আমাদেরকে উপহার দিতে পারবেন? এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, সরকার যদি যথাযথ উদ্যোগ ও আন্তরিকতার সাথে কমপিউটার শিক্ষায়ন কর্মসূচী হাতে না নেয় তাহলে আমাদের সামগ্রীক উন্নয়ন কর্মসূচী অতীতের সব উন্নয়ন তৎপরতার মতই ব্যর্থতার পর্যবসতি হবে।

কমপিউটার ও কমপিউটার পেরিফেরালস উপর বিদ্যমান বিভিন্ন কর ও শুল্কের চিত্র ঃ

• সরকারের শুল্ক বিভাগের কতিপয় মহারথী ব্যক্তি নিজেদেরকে খুবই বিজ্ঞ মনে করেন এবং বুঝে না বুঝে কমপিউটার ও এর পেরিফেরালস–এর উপর অযৌক্তিক শুল্ক চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের বাহাদুরী ও ক্ষমতা প্রদর্শনে ব্যস্ত থাকেন। উনারা খোজ খবর নেন না যে বহির্বিশ্বে কমপিউটার ও এর পেরিফেরালস মূল্য ক্রমশঃই হ্রাস পেয়ে চলছে। এর ঠিক বিপরীতে চিত্র দেখা যায় বাংলাদেশে। ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভেনিউ যে বইয়ের কোর্ড ব্যবহার করে কমপিউটার ও এর পেরিফেরালসের উপর করারোপ করছেন তা এক বছরের পুরানো পাকিস্তানী একটি কোর্ড বই। এ অবস্থায় অবসান হওয়া দরকার অতি শীঘ্রই।

গতিশীল আগামী শতাব্দীতে উত্তরণের লক্ষে আমাদেরকে ব্যাপক কমপিউটারাইজেশন কর্মসূচী হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এর পিছনে থাকতে হবে সরকারের আন্তরিক ও অব্যাহত সমর্থন এবং সহযোগিতা। আর জনগণকেও হতে হবে সরকারের যোগ্য সহযোগী। আর এব্যাপারে সরকারকেই পালন করতে হবে মুখ্য ভূমিকা।

কমপিউটার শিল্পকে আত্মস্থকরণ এবং এর মাধ্যমে জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে কিছু প্রস্তাবনা ঃ

১। স্কুল পর্যায়ে কমপিউটার শিক্ষা চালুকরণ এবং এই লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজীতে কমপিউটারের বই প্রকাশ।

২। অতিসত্বর "কমপিউটার শিক্ষক" প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালুকরণ।

৩। রেডিও ও টিভি–তে কমপিউটার ব্যবস্থা এবং এর উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সহজবোধ্যভাবে সম্যক ধারণা প্রদান।

৪। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিত্য দিনের কাজে কর্মে কমপিউটার ব্যবহারকারীদের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উভয় ক্ষেত্রেই ১০০৫ প্রাথমিক অবচয় (depreciation) দেওয়া উচিত।

৫। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে 'কমপিউটারাইজড একাউন্ট' এর জন্য কর বিভাগ কর্তৃক অতিরিক্ত সুবিধাদি প্রদান।

৬। সরকার প্রণীত আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং লীজ কোম্পানিকে নিম্নতম সুদে কমপিউটারাইজড বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদানে ব্যবস্থাকরণ।

৭। যোগাযোগ ব্যবস্থাগত অবকাঠামোকে (Communication infrastructure) উন্নতর ব্যবস্থায় রূপান্তরিতকরণ। Data Entry Business, অন্যান্য সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার বাণিজ্য জগতের প্রতি মুহূর্তের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং বর্হিবিশ্বে তথ্য প্রেরণের জন্য স্যাটেলাইট ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে কিছু Communication High-Way তৈরীকরণ অত্যন্ত জরুরী। বিদ্যমান অবস্থায় আমাদের কোন ব্যবহার উপযোগী নিজস্ব Information Gateway নেই, অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সাত সাতটি Gateway বিদ্যমান।

৮। স্বচ্ছ, সময়োপযোগী এবং সার্বজনীন 'জাতীয় কমপিউটার নীতি' জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ করানো।

৯। কমপিউটার সংশ্লিষ্ট Intellactual Property/Right সংরক্ষণ কল্পে একটি নতুন ও আলাদা 'ট্রেড মার্ক ও কপি রাইট আইন' প্রণয়ন ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ করানো উচিত, যা কমপিউটার বাণিজ্যিক দস্যুতাকে রোধ করবে কঠোর হস্তে। কারণ ঃ আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে Intellactual Piracy একটা মামুলী চুরিতে দাঁড়িয়েছে। বেশীর ভাগ লোক মনেই করে না যে এটা একটা বিরাট অপরাধ। Intellactual Piracy যেমন স্থানীয় মেধা ও প্রজ্ঞার প্রসারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি বাইরের মেধা ও প্রজ্ঞা এবং এতদ্বসংশ্লিষ্ট পুঁজির আগমন ও বিকাশকে ব্যহত করে। কমপিউটার সফটওয়্যার কোম্পানীগুলোর অভিযোগ অনুযায়ী পাঁচশত মার্কিন ডলার মূল্যের কোন বহুল প্রচলিত সফটওয়্যার প্রোগ্রাম দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহে মাত্র সাড়েসাত মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়। দেখা যায় নকল করা (Counterfeit) কমপিউটার বিক্রি হয় ৫/১০টি সফটওয়্যার প্রোগ্রামসহ এবং এতদ্বসংশ্লিষ্ট চুরি করা বই ও ম্যানুয়েলও দেওয়া হচ্ছে বিনে পয়সায় অথচ এগুলোর উৎপাদন ব্যয় বিক্রয় মূল্যের চাইতে অনেক বেশী।

এই জন্য আমেরিকার সরকার কর্তৃক ১৯৮৮ সালের OMNIBUS TRADE ACT SECTION-301 মেনে চলার জন্য তাইওয়ান, থাইল্যাণ্ড ও ইণ্ডিয়ান সরকার চরম চাপের সম্মুক্ষীণ হচ্ছেন।

১০। কিছু কমপিউটার পেরিফেরালস–এর উপর সর্বনিম্ন রাজস্ব ও কর ধার্যকরণ এবং এগুলোর উপর অযৌক্তিক ৩০৫ ফিক্সড ট্যারিফ রহিতকরণ।

১১। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে কমপিউটারকে শুধু মাত্র দর্শনীয় বস্তু হিসাবে সুদৃশ্য নেকাবে আবৃত না রেখে এর সঠিক ও যথাযথ ব্যবহারের জন্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সর্ব অধঃস্তন কর্মচারী পর্যন্ত সবাইকে আন্তরিক হতে হবে এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য ট্রেনিং–এর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২। বিজ্ঞানী ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে একটি 'তথ্য প্রযুক্তি ও কমপিউটার শিল্প মন্ত্রণালয়' গঠন।

আমরা সবাই বলি, শুরু করা দরকার কিন্তু শুরু করি না, অন্যের সমালোচনায় মুখর হই— নিজের কর্মের মূল্যায়ন করি না, অন্যের সফলতায় ঈর্ষান্বিত হই— নিজে চেষ্টা করি না। এই অবস্থা আর কত দিন চলবে? বর্হিবিশ্বে আজ আমাদের অবস্থান কোথায়?

আমরা কি চিরদিন ভিক্ষার ঝুলি নিয়েই ঘুরবো, নাকি নিজেরা নিজেদের স্বল্প পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর বিনিয়োগের দ্বার উন্মোচন করবো— জাতিকে আজ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। বিশ্বব্যাপী যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে সেই স্রোতে নিজেদেরকে ভাসাবার মত যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি তৈরী করতে হবে। সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কি বিচিত্র সেলুকাস! আমাদের কোটি টাকার স্বপ্নের সংসদ সৌধে এ বছর জাতীয় বাজেট পাশ হয়েছে মাত্র কিছু দিন হলো, অথচ ট্রেজারী বেঞ্চ কিংবা বিরোধী দল কেউ এই 'অত্যাধুনিক ও অতীব প্রয়োজনীয়' প্রযুক্তি সম্পর্কে একটি বর্ণও উচ্চারণ করেননি। যদি এমনটি হবে তাহলে আর জনগণকে কেন মিথ্যা আশ্বাস, সাংসদরা জন প্রতিনিধি এবং উনারা জনস্বার্থ সংরক্ষণ করবেন? ✤

বাংলাদেশের 'বাংলা'

(১৭ নং পৃষ্ঠার পর)

মহা তৎপর হয়ে উঠেছে। বিএসটিআই–র ইলেকট্রিক ডিভিশন মান শাখার ডেপুটি ডাইরেক্টর আতাউল কবীর আমাদের জানান, তারা কমপিউটারে বাংলা কোডিং সম্পর্কে আগে কিছুই জানতেন না। সম্প্রতি তাঁরা বিষয়টি জেনেছেন এবং তাদের এখানে কোন কমপিউটার এক্সপার্ট নেই। এই বিষয়ে তারা এখন জোর খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

কে নেবে এ ব্যর্থতার দায়

এরপর কি হবে? 'বাংলা' কি আলাদা হবে? নাকি বাংলা ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে? ১৯৮৭ সন থেকে বাংলাদেশে কী বোর্ড প্রমিতমরণের কাজ শুরু হলে কমপিউটার কাউন্সিলের তদানীন্তন কর্তারা এর কমিটিকে একটা মহাজন কমিটিতে পরিণত করেন। বাংলা একাডেমী কী বোর্ড তৈরীর নামে বিদেশ সফরের আয়োজন করে এবং শেষ পর্যন্ত টাইপরাইটার ব্যবসায়ীদের ইচ্ছাপুরণ করে ক্ষান্ত হন। এর মধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পুনা বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্ব দিয়ে বাংলার বাইরে বাংলার কীবোর্ড তৈরী করে ফেলে। সেখানে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাংলাদেশে কমপিউটার কীবোর্ড ও কোডিংপ্রমিতকরণে মহাজন ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার দাপট প্রায় তাণ্ডবের রূপ নেয়। বিজ্ঞানীদের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়।

কী বোর্ড প্রমিতকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য কমপিউটার জগৎ মাথা কুটতে থাকে, কিন্তু সবাইকে খুশী করার জন্য কখনো গাধাকে কাঁধে কখনো গাধার পিঠে সওয়ারী হয় নীতিনির্ধারকরা। এ তামসার মধ্যে রাজনৈতিক সরকারের অতি বিজ্ঞ রাজনৈতিক মন্ত্রী এবং বড় পদ পদবীর অধিকারী দায়িত্বহীন কর্তারা হাই তুলে সময় যাপনকালে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত ভারতের বাংলার কোডিং আইএসও–র স্বীকৃতি নিয়ে আসায় বাংলাদেশ এক নতুন সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অন্ধ গহবরে নিপতিত হলো। আগামী দশকের মধ্যে এটাই উর্দুর আধিপত্যের মত বাংলা ভাষার পরিধিকে সীমিত সংকুচিত করে তুলবে।

কেবল আপন ভাষার অধিকারকে দায়িত্বহীন উপেক্ষায় অন্য জাতির হাতে আবারও তুলে দেবার কারণে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী তৎকালীন খাদ্য নাজিমুদ্দিন ও বর্তমান বিসিসি কর্তারা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গনে গুলীবর্ষনকারী তৎকালীন নুরুল আমীন ও ঘাতক পুলিশের মত ভাষা দমনকারী ঘৃণিত চরিত্রের অবস্থানে অধঃপতিত হলে ইতিহাস বিস্মিত হবে না।

এই শিক্ষামন্ত্রী, এই ডক্টরেটধারী এমপি এবং কেন্দলে ব্যাপৃত বিসিসির উপরেই ইতিহাসের নিন্দা এসে থেমে থাকবে না— এসব ব্যক্তিদের ধারক বাহক বর্তমান রাজনৈতিক সরকারকেও এই সমগ্র অপরাধ ও ব্যর্থতার দায় আপন স্কন্ধে তুলে নিয়ে ইতিহাসের সামনে দাঁড়াতে হবে। ✪